Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 1 –7
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মহাপ্রভুর সুগভীর গম্ভীরা লীলা : বিরহের প্রেক্ষিতে

রূপালী দাস
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : shyamsundarroy822@gmail.com

Keyword
রাধারানী, কৃষ্ণ, মহাপ্রভু, গম্ভীরা, বিরহ, দিব্যোন্মাদ, শ্রীক্ষেত্র

Abstract
শ্রীক্ষেত্রে কাশী মিশ্রালয়ে প্রেমের ঠাকুর গৌরসুন্দরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁর দিব্য জীবনের শেষ বারো বছর কৃষ্ণ বিরহিণী রাধারানীর মহাভাবে বিভাবিত হয়ে প্রতি পলে পলে যে অসমোর্দ্ধ লীলাদি আস্বাদন করেছিলেন তাই গম্ভীরা লীলা নামে পরিচিত। বিপ্রলম্ভরসের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই অব্যক্ত গম্ভীরালীলা প্রবাহ যেমন বিরামহীন তেমন অশ্রুত। এই যে গম্ভীরা লীলা, এখানের প্রেমসিন্ধু হলেন গোরা রায় আর তাঁর সঙ্গে গঙ্গা ও যমুনা ধারার মত মিলিত হয়েছে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। গভীর নিশীথে মাথুর বিরহ কাতরতা ব্রজবিরহিণী রাধারানীর ভাবে কাতর মহাপ্রভু তঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধরে বিলাপ করছেন। তিনি যেন ব্রজের শ্রীরাধারানী, কৃষ্ণবিরহে কাতরা হয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয়া সখী ললিতা ও বিশাখার কণ্ঠ ধরে কাঁদছেন আর সখীগণ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এই রাধারানীর দিব্যোন্মাদ ও মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ, এই দুইটি জিনিস স্বরূপত এক হলেও ভাববৈকল্যে এবং গাম্ভীর্যে মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলারই অতিশয় আধিক্য বলে জানতে হবে।

Discussion
শ্রীক্ষেত্রে কাশী মিত্রের গম্ভীরা ঘরে দিন রাত্র 'হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বিলাপ। গম্ভীরায় গৌরসুন্দর যেন বিরহ রসের মূর্তিমান বিগ্রহ। 'পদামৃত মাধুরী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র অপূর্ব বলেছেন –

> "নীলাচলে দিগন্ত-বিস্তৃত জলনিধি অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আর তাঁহারই অনতিদূরে গম্ভীরায় অপার ভাবনিধি শ্রীগৌরচন্দ্র ভাবের অনন্ত তরঙ্গ-হিল্লোলে থাকিয়া থাকিয়া বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছেন। চঞ্চলচল নীলাম্বুধিরও তুলনা নাই, নবনব বিভ্রমশালী মহাপ্রভুরও তুলনা নাই। অপার পারাবার অশান্তভাবে ঢেউ এর পরে ঢেউ তুলিয়া বালুকার বেলাভূমিতে আছাড়িয়া পড়িতেছে, আর গৌরচন্দ্রের ভাবাম্বুধি উচ্ছলিত হইয়া প্রতিক্ষণে তাঁহার সু-উন্নত দেহকে ক্ষুব্ধ বিধ্বস্ত মথিত করিতেছে। তাই বোধ হয় নীলাচলে সমুদ্র তাঁহার যোগ্য প্রতিবেশী হইয়াছিল।"[১]

মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ নব নব মহাভাবের লীলাবিলাস যেন আমাদের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার মাধুর্যপূর্ণ রাধারানীর প্রজল্প ন্যায় অবস্থা স্মরণ করায়। এই নীলাচলে গম্ভীরালীলা যেন মহাপ্রভুর স্থায়ীভাব। সেজন্যেই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন- 'নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ'। মহাপ্রভুর ধরাধামে প্রকট ছিলেন মাত্র আটচল্লিশ বৎসর। আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ কর্মলীলাকে ভাগ করলে তিনটি পর্যায় পাই। একটি খণ্ড নবদ্বীপ লীলা, একটি খণ্ড পরিব্রাজক লীলা এবং একটি খণ্ড নীলাচল লীলা। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' এই ভাবেই বর্ণনা করেছেন। নবদ্বীপ লীলায় কেটে যায় প্রভুর চব্বিশ বৎসর, পরিব্রাজক লীলায় প্রভু অতিবাহিত করেন আরও ছয় বৎসর এবং বাকি আঠারো বৎসর প্রভু কাটিয়েছেন নীলাচলে। এই আঠারো বৎসরের মধ্যে আবার বারো বৎসর প্রভু বিপ্রলম্ভ রসে প্রবিষ্ট ছিলেন। এই শেষ বারো বৎসরের লীলাকে বৈষ্ণব জগতে বলা হয় গম্ভীরা লীলা।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' শ্রীগ্রন্থে মহাপ্রভুর এই বিরহ অবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। সুনিপুণ শিল্পীর মতো এত অপূর্ব বর্ণনা পদাবলী সাহিত্যে দুর্লভ। শ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায় বিরহ রসটি মহাপ্রভুতে মূর্তিমান হয়ে আছে। তিনি এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন –

"সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং
মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুহুরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতম্।
উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ করুণকরুণো দীর্ঘ-হাতেতি-নাদো
গৌরঃ কোহপি ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নশ্চকাস্তি।।"[২]

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত' গ্রন্থে পদটির সমুধুর বঙ্গানুবাদ আছে–

"হে গৌরাঙ্গ রসময় রাধিকা নাগর হে কত রূপে করিছ বিহার।
শ্রীরাধা বিরহ ভাব সিন্ধু মাঝে ডুবিহে ফেলিতেছে নয়ন আসার।।
অশ্রু অভিষিক্ত তব দিব্য গণ্ডস্থল হে ঝল মল করে অনুক্ষণ।
শ্রীমতী বিচ্ছেদে পড়ি সুদীর্ঘ নিশ্বাস হে ছাড়িতেছে কভু ঘনে ঘন।।
বিরহ ব্যথায় কভু করি হায় হায় হে যে ক্রন্দন করিছ ফুকারি।
শুনি তা পাষাণ হিয়া অন্য পরে কিবা হে অজস্র বরষে আঁখিবারি।।
এরূপ যখন যাহা কর ইচ্ছা বশে হে সকলি অপূর্ব্ব কৃপাময়।
ধন্য ধন্য কলিযুগে বিলাস তোমার হে তুমি নাথ! নিত্য লীলাময়।।"[৩]

এই গম্ভীরায় গম্ভীরানাথ গোবিন্দবিরহিণী শ্রীরাধিকার সেই দিব্যোন্মাদ সিন্ধুতে নিমগ্ন। নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছেন এই দিব্যোন্মাদ সিন্ধুতে। রাধাভাবে তিনি সতত আকুল। 'কোহপি ব্রজবিরহিণী' কোন অনির্বচনীয়া প্রেমস্বরূপা এই শ্রীরাধারানী। এই রাধা ভাবে 'বর্ত্ততে' তিনি শোভা পাচ্ছেন। ব্যাখ্যাকার আনন্দী লিখলেন 'সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে'। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের এই ছবিটি, হচ্ছে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। গম্ভীরায় বসেই প্রভু আস্বাদন করছেন ব্রজবিহরিণীর ভাব। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ প্রথমেই বলেছেন, 'সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং' অর্থাৎ বিরহিণী রাধারানীর ভাবে গৌরসুন্দর বিষণ্ণ বদনে বাম কপোলে বাম হাতটি রেখেছেন। মনে হচ্ছে এটিই যেন বিরহের মুদ্রা। বাম গালে বাম হাত রাখার জন্য গালটি পাণ্ডুর হয়ে গেছে। এবং তা হতে অবিরত ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে। প্রভুর এই আস্বাদন নিত্য। বাসু ঘোষের এক পদে আছে, স্বরূপ দামোদরের হাত ধরে প্রভু অঝোর ধারায় কাঁদছেন আর বলছেন, আমার শ্যামরায় বিহনে সারারাত জেগে কাটালাম, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, বলো কোথায় আমার শ্যাম রায়। শ্যামের জন্য সারারাত ফুল সাজিয়ে অপেক্ষা করলাম কিন্তু শ্যামপ্রেম মধু পেলাম না। কৃষ্ণ বিরহে আর প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না তাই –

"চল রে স্বরূপ চল যাইয়া যমুনা জল
এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক কুলমান আর না রাখিব প্রাণ

তেজিব সলিলে ঝাঁপ দিয়া।।"[৪]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোন যুগের কোন অবতারের মধ্যে এই ভাববিকার শাস্ত্রে লক্ষ করেননি। তাই তিনি বলেছেন—

"এই তো কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকের লাগে চমৎকার।।"[৫]

প্রভু যা ভাব বিকার প্রকট করলেন, তা শ্রবণ করলেই মানুষ চমৎকৃত হচ্ছেন। প্রভুর এই দিব্যোন্মাদ ভাব এবং প্রলাপ যে অদ্ভুত তাতে কোন অসত্য নেই। আমরা অদ্ভুত বলতে বুঝি যা নিত্য ঘটে না। যা নিত্য ঘটে তা আশ্চর্য নয় এবং অদ্ভুতও নয়। প্রভুর সমস্তই অদ্ভুত এবং অলৌকিক। গৌরসুন্দরের সুগম্ভীর লীলায় রাধারানীর যে দিব্যোন্মাদ,এই দিব্যোন্মাদই হচ্ছে তাঁর স্থায়ীভাব। আসলে এই ভাবটি অনেকটা মহাসমুদ্রের মতো। সমুদ্রে যেমন সর্বদা ছোটো বড় তরঙ্গে পূর্ণ থাকে তেমনই প্রেমিকের স্থায়ীভাব-সিন্ধুটি, তেমনি বিবিধ সঞ্চারীভাব, অনুভাব এবং সাত্ত্বিক ভাবরূপ তরঙ্গে সমাকুলিত থাকে। সমুদ্রে আলোড়ন যত বেশী হয়, এই তরঙ্গগুলিও ততই প্রবলাকার ধারণ করে। আবার তিথি বিশেষে সমুদ্রে আলোড়ন সর্বাধিক হয়। যেমন পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্র প্রচুর আলোড়িত হয়। তেমনই শ্রীরাধারানীর যে দিব্যোন্মাদ, এই দিব্যোন্মাদের সর্ব্বাধিক প্রকাশ হয় স্থায়ীভাব-সিন্ধুতে। কারণ এখানেই ঐ বিরহ ভাবের উন্মাদনা। মহাপ্রভুর এইভাবের কারণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধব দর্শনে রাধিকার যে উন্মাদ ভাব দশাপ্রাপ্ত হয়েছিল তেমন ভাবে দিনরাত্র মহাপ্রভু থাকেন—

"রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে।।"[৬]

আবার ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন,-

"রাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে।।"[৭]

উদ্ধবকে যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে ব্রজে পাঠান, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকার অবস্থা ভাগবতে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হয়ে উদ্ধব যখন ব্রজে এলেন, তখন তাঁর মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনে শ্রীরাধার বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠলে বিরহজনিত উন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করেছিলেন, সন্ন্যাসের শেষ বারো-বৎসরও শ্রীকৃষ্ণ বিরহ স্ফূর্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু রাত্রি-দিন সেইরূপ প্রলাপ বাক্যাদি প্রকাশ করতেন। অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিত্তবিভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে উচ্চহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার এবং বিপরীত-ক্রিয়াদি লক্ষিত হয়ে থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এর লক্ষণে বলা হয়েছে—

"উন্মাদোহৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসোনটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং।
প্রলাপোধাবনক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ।।"[৮]

উদ্‌ঘূর্ণা- নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্যচেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে স্থায়ীভাব প্রকরণে বলা হয়েছে, 'স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্'। উদ্‌ঘূর্ণার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট বললেন, হে সখা, তোমার বিরহে শ্রীরাধারানী ভ্রান্তা হয়ে কখনও বাসকসজ্জার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করছেন,কখনও বা খণ্ডিতাভাব অবলম্বন করে অতিশয় ক্রুদ্ধা হয়ে নীলমেঘের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন করছেন, কখনওবা অভিসারিকা হয়ে নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। 'ললিত মাধব' নাটকের তৃতীয়াঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পর শ্রীরাধার এই উদ্‌ঘূর্ণা ভাব দেখা যায়। যথা,

"শয্যাং কুঞ্জগৃহে ক্বচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা
নীলাব্ভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী ক্বচিত্তর্জ্জতি।
আঘূর্ণত্যভিসারসংভ্রমবতী ধ্বান্তে ক্বচিদ্দারুণে
রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাং।।"[৯]

এই ভ্রমময় অবস্থায় অর্থাৎ নিজেকে অপর এবং অপরকে নিজ বলে ভ্রান্তিময় আচরণ করতেন গৌরচন্দ্র এবং সর্বদা প্রলাপ করতেন। প্রলাপ অর্থাৎ অকারণ বাক্যপ্রয়োগ। যে ব্যক্তি উপস্থিত নেই, তাকে উপস্থিত মনে করে তার প্রতি লক্ষ্য করে যে কথা বলা হয় তাকে প্রলাপ বলে। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে, 'অলক্ষ্যবাক্প্রলাপঃ স্যাদিত্যাদি'। রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন, 'ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ' অর্থাৎ ব্যর্থ আলাপকেই প্রলাপ বলে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে, 'করোতি নাদং মুরলী রলী রলী ব্রজাঙ্গনা হৃন্মথদং থনং থনম্। ততো বিদূনা ভজতে ভজতে জতে জতে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা।।' উন্মত্তা রাধারানী বললেন, কৃষ্ণ বুঝতে পারলাম ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয় মথিত করে তোমার মুরলী (রলী রলী) শব্দ করছে, তাতেই ব্যথিতচিত্ত হয়ে ললিতা (লিতা, লিতা) তোমার ভজন (জন,জন) করছে। এই শ্লোকের মধ্যে রলী রলী, থনং থনং, জতে জতে, লিতা লিতা, জন জন এই শব্দগুলি ব্যর্থ-নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যর্থ উক্তিই প্রলাপ। এই ভাবে কৃষ্ণ বিরহে মহাপ্রভুর চিত্ত এতদূর বিভ্রান্ত হয়েছিল যে তিনি এক করতে গিয়ে আর এক করে বসছেন, সর্বদা অকারণ-বাক্য বলে প্রলাপ বলছেন।

কবিরাজ গোস্বামী প্রথমেই সাত্ত্বিক ভাববিকারের কথা বললেন –

"রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে ।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।।"[১০]

বিরহের তীব্রতা এত বেশী যে রোমকূপ হতে রক্ত নির্গত হচ্ছে এবং দন্ত সব কাঁপছে। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বিকারের একটি অঙ্গ হল স্বেদ। কিন্তু মহাপ্রভুর তা হতে রক্ত বের হচ্ছে। দেখা যাক সাত্ত্বিকভাব কাকে বলে এবং সাত্ত্বিকভাব কয় প্রকার। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখেছেন,

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ।।"[১১]

যখন ভাবুকের চিত্তটি কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কারণে সাক্ষাৎভাবে বা কিঞ্চিত ব্যবধানে আক্রান্ত হয়, তখন সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলা হয়। আর 'সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবা' অর্থাৎ বাইরের যে সমস্ত ভাব সত্ত্বের থেকে উৎপন্ন হয় তাকেই সাত্ত্বিক বলে। সাক্ষাৎ বলতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চরস বা ভাবের দ্বারা ভক্তের চিত্ত যখন আক্রান্ত হয় তখন তাকেই সাত্ত্বিক বলা হয়। এই সাত্ত্বিকভাবগুলিকে গোস্বামীপাদগণ পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। এক বিরাট আখের বনে যদি মদমত্ত হাতি প্রবেশ করে তাতে সে সমস্ত আখের বনকে চূরমার করে দেবে। তেমনই মহাপ্রভুর কোমল শ্রীঅঙ্গটি আখের বনের মতো। আর এইসকল ভাব মহামত্ত হাতির মতো। তাই প্রভুর শ্রীঅঙ্গের এই অবস্থা। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়,

"মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ তনু মন অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন।।"[১২]

এই ভাববিকারের ফলে অর্থাৎ বিরহ স্ফূর্তিকালে দেহ কখনও ছোট হত, কখনও বা বড় হত। অর্থাৎ দেহ কখনও কৃশ কখনও বা স্থূল। ছোট হয়ে একবার প্রভু কূর্ম্মাকৃতি হয়েছিলেন তখন প্রভুর হস্ত পদ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মুখে ফেনা, পুলক অঙ্গে, নেত্রে অশ্রুধার, অচেতন হয়ে পড়ে আছেন দেখে মনে হচ্ছে যেন কুষ্মাণ্ড পড়ে আছে,

"পেটের ভিতর হস্ত-পদ কূর্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার।।
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল।।"[১৩]

আবার কখনো প্রভু দীর্ঘ পড়ে আছেন যেন তাঁর শ্রীদেহ পাঁচ ছয় হাত লম্বা হয়েছিল। এক এক শ্রীহস্ত শ্রীপদ প্রায় তিন হাত দীর্ঘ হয়েছিল এবং অস্থিগ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হয়েছিল। দেখলে মনে হবে যেন চর্মের উপরে অস্থিসন্ধিগুলি দীর্ঘ হয়ে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, প্রভুর প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার ধারণ করেছে, তার উপরে রোমদ্গম কদম্বের মতো, কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না, কাঁপতে কাঁপতে প্রভু ভূমিতে পড়ে যাচ্ছেন বারবার। এই সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত-বিকার। রঘুনাথ দাস তাঁর 'গৌরাঙ্গস্তব কল্পতরৌ' চতুর্থ শ্লোকে বলছেন, মহাপ্রভুর এই মূর্তি আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকুক,

"ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘং ভুজপদোঃ।
লুণ্ঠন ভূমৌ কাক্কা বিকলং গদগদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হ্রদয়ে উদয়ন্মাং মদয়তি।।"[১৪]

তবে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁর 'গোপালচম্পূ' তে বলেছেন, যখন রাধারানীর চিত্রজল্প ভাবের উপশম হয়েছিল অর্থাৎ ভ্রমর চলে গেলে তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়ে যান। এই মূর্ছা দশায় তাঁর দেহের মধ্যে এমন একটা অনুভাব এল, যে সখীগণ তখন তাঁকে চিনতে পারেনি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু বিকৃতিও এসেছিল।

প্রভু গম্ভীরা ভিতরে আছেন, দিন রাত্রির ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠায় বহির্গমনের চেষ্টায় বাহ্যজ্ঞানহারা মহাপ্রভু ঘরের দেওয়ালে মুখ ও মাথা ঘষতেন, তার ফলে প্রভুর মুখে ও মাথায় ক্ষত হয়ে যেত এবং ঐ ক্ষত স্থান হতে রক্ত নির্গত হত। শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু সর্বদাই কৃষ্ণের লীলা, লীলাস্থলী চিন্তা করতেন। করতে করতে তাঁর কৃষ্ণ বিরহে শূন্যতা দেখা দিল এবং বিরহে তিনি বলছেন, 'কাঁহা কঁরো, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন/কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন'। এই ভাবে বিলাপ করতে করতে বিহ্বল হয়ে রামানন্দ রায়ের শ্লোক নিরন্তর পড়ছেন। শ্লোকটি 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে তৃতীয় অঙ্কে নবম শ্লোকে মদনিকার প্রতি রাধারানী বলছেন,

"প্রেমচ্ছেদরুজোহবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা।
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুরবলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবম্
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ।।"[১৫]

শ্রীরাম রায়ের নাটক হতে জানা যায় কোন এক সময়ে রাধারানী সখীদের নিয়ে বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে গিয়েছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণও সখাদের নিয়ে অপর এক অংশে বিরাজ করছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে তাঁরা একে অপরকে দর্শন করে পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হয়ে যান। উভয়েই উভয়ের সাথে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। শেষে অধৈর্য হয়ে রাধারানী শশীমুখী নামে এক সখীকে দিয়ে কৃষ্ণের সমীপে একটা প্রেমপত্র পাঠালেন। চতুর শিরোমণি কৃষ্ণ সেই পত্র পাঠ করে খুব আনন্দিত হলেন এবং নিজের ব্যাকুলতা চেপে রেখে সামান্য উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন

এবং রাধারানীর প্রেরিত সখীর কাছে রাধারানীর কুল-শীল, পতি সেবার কথা বললেন। আমরা এই চাতুরালি দেখেছি রাস রজনীতে, কৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে সব গোপীদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করছেন, এত রাত্রে কেন এসেছ তোমরা? তোমাদের বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে, তোমরা ঘরে ফিরে যাও। সেই বাক্য শ্রবণে গোপীদের অন্তর বিরহে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তেমনই এই উপেক্ষা বাক্য শ্রবণ করে শ্রীরাধারানী এই শ্লোক উচ্চারণ করে নিজের বিরহাতুর অবস্থা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রেমের বিচ্ছেদ জনিত যে রোগ, প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে যে অব্যক্ত বেদনা জন্মায় তা কৃষ্ণ জানে না। যদি জানতেন তাহলে আমায় এইভাবে বিচ্ছেদের সমুদ্রে ডোবাতে পারতেন না। প্রেম কখনোই উত্তম, অধম, পাত্রাপাত্র বিচার করে না। সে তার মতোই চলতে থাকে। এদিকে আমাদের যৌবনকে বিশ্বাস নেই, কারণ সে অল্প সময়ই থাকবে। হে বিধাতা, এখন আমার গতি কি হবে? এই ভাবে প্রভু 'রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর'।

বিরহজাত চিত্তবিকার, দিব্যোন্মাদ, এবং অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ধরত না। জলভর্তি কলসে যদি আবার জল ঢালা হয় তাহলে জল উপচে পড়ে। সেই রকম কৃষ্ণবিরহে প্রভুর চিত্তে যে ভাবের উদয় হত তা প্রভুর শ্রীদেহে কুলাত না ফলে তা প্রভুর শ্রীঅঙ্গকে বিমর্দ্দিত করত। সর্বোপরি প্রভুর এই ভাব নিত্য নবায়মান। আবার দিন অপেক্ষা রাত্রে ভাবের তরঙ্গ উত্তাল। একবার রাধারানী বলছেন ললিতা সখীকে, যে সকল ভাগ্যবতী রমণী প্রিয়-বিরহে স্বপ্নের মধ্যেও তার প্রিয়কে দেখতে পায়, তাঁদের সত্যিই ভাগ্যবতী বলে জানতে হবে। কিন্তু ললিতা সখী সেই সৌভাগ্যও আমার নেই। কারণ গোবিন্দ চলে গেলেন বলে আমার নিদ্রাও চলে গেল। আমি এমনই অভাগিনী সেই সৌভাগ্য সুখ হতেও বঞ্চিতা। নরহরি ঠাকুরের পদ আস্বাদন করলে দেখতে পাবো মহাপ্রভু এই ভাব নিয়েছেন। পদটি –

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়।।
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ।।
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কেহ নাহি রহু পহুঁ পাশে।।
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ ।।
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা।।"[১৬]

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধারানীর যে দশ দশা (চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা/প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ) হয়েছিল। এই সমস্ত দশা মহাপ্রভুর মধ্যে প্রকটিত ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়,

"কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ-দশা হয়।
সেই দশ-দশা হয় প্রভুর উদয়।।
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নাহি মনে।।"[১৭]

কৃষ্ণপ্রেমের চরম অবস্থার নাম মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ। একমাত্র তাঁর কৃপাতেই আমরা এইভাবের আস্বাদন করে ধন্য হতে পারি।

তথ্যসূত্র :

১. ব্রজবাসী, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র, 'শ্রীপদামৃতমাধুরী' (২য়খণ্ড), শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ
২. সরস্বতী, শ্রীল প্রবোধানন্দ, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', রামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন অনুবাদিত, আষাঢ় ১২৯১, পৃ. ৯৮
৩. বাবাজী, শ্রীকিশোরীদাস, (সম্পাদিত), 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', ১৩ বৈশাখ ১৪০৮, পৃ. ৫৮

৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত), ‘বৈষ্ণবপদাবলী’, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৮৩
৫. কবিরাজ, শ্রীল কৃষ্ণদাস, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, গীতা প্রেস, পৃ. ৬১১
৬. ঐ, ঐ, পৃ. ১৬৮
৭. ঐ, ঐ, পৃ. ১৭৬
৮. গোস্বামী, শ্রীল রূপ, ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘতঃ, পৃ. ২৭২
৯. গোস্বামী, শ্রীল রূপ, ‘উজ্জ্বলনীলমণি’, রামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন অনুবাদিত, তারা লাইব্রেরী, পৃ. ৭৯৭
১০. কবিরাজ, শ্রীল কৃষ্ণদাস, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, গীতা প্রেস, পৃ. ১৭৬
১১. গোস্বামী, শ্রীল রূপ, ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘতঃ, পৃ. ১৯৫
১২. কবিরাজ, শ্রীল কৃষ্ণদাস, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, গীতা প্রেস, পৃ. ১৮২
১৩. ঐ, ঐ, পৃ. ৬২৯
১৪. ঐ, ঐ, পৃ. ৬১০
১৫. ঐ, ঐ, পৃ. ১৭৬
১৬. ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৬
১৭. ঐ, ঐ, পৃ. ৬০৯